বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র
দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংকলন
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭৮

● Science and Technology in 'Draft Five Year Plan' 1978-83
● ভারতীয় নৃতত্ত্ব গবেষণা কোন্ পথে—৯
● চীনের নতুন বিজ্ঞাননীতি
● রিপোর্ট—১৩

সম্পাদকীয়

একটি পশ্চাৎপদ দেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবহার অবশ্যই প্রয়োজন। এ নিয়ে মতভেদ নেই। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে এ সম্পর্কেও বোধ হয় কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। তবু বিজ্ঞানের বাস্তব ভূমিকা ও কার্য্যকর প্রভাব দেশে দেশে গুণগতভাবে বা পরিমানগতভাবে আলাদা—যা হয়ে থাকে সমাজকাঠামো ও বিজ্ঞানের প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের জন্যই। যে কোন দেশের বিজ্ঞাননীতি নির্দ্ধারণ করতে হলে বা সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ব্যবহার্য্য মাপকাঠি ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী আগেই স্থির করে নেওয়া দরকার।

আমরা আমাদের কথাই বলি। **প্রথমত,** দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনধারণের মান ও সাংস্কৃতিক উন্নতির মাত্রাই আমরা বিজ্ঞান বিকাশের আসল সূচক বলে মনে করি। দেশে কটা গাড়ী চলে বা দেশে কটা ভারি শিল্প এরকম সব হাস্যকর মানমাত্রা দিয়ে প্রগতির পরিমাপ করা ভুল। **দ্বিতীয়ত,** বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা আধুনিকতা ও আত্মনির্ভরতা দুটোই চাই। কিন্তু স্বনির্ভরতার প্রশ্নটিকে পাশকাটিয়ে শুধুই আধুনিকতা বা যে-কোন উপায়ে আধুনিকতার আমরা ঘোর বিরোধী। **তৃতীয়ত,** কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় জরুরী বিষয় বাদ দিয়ে স্বল্পমেয়াদী স্বার্থের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের ওপর জোর দেওয়ারই আমরা পক্ষপাতী—এমন কি তা সাময়িক কষ্টের মূল্যে হলেও। **চতুর্থত,** আমরা মনে করি বিজ্ঞান শুধু বিশেষজ্ঞদের বিষয় নয়। সমাজের উৎপাদিকাশক্তির মূলে যে জনগণ তাঁদের মতামত ও ভূমিকাকে বিজ্ঞানীর সমমর্য্যাদার মূল্য দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিকাশ ও সমাজকল্যাণের স্বার্থেই তাঁদের সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আজ জরুরী। **পঞ্চমত,** শুধু বড় বড় পরিকল্পনার খসড়া তৈরি নয়—মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছোট ছোট বিকেন্দ্রীভূত গ্রামমুখী পরিকল্পনার সময়-নির্দিষ্ট আন্তরিক রূপায়ণ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় প্রচেষ্টা হল বৈজ্ঞানিক পথে উন্নতির আবশ্যিক সর্ত। **ষষ্ঠত,** আমাদের মতে যে কোন পরিবর্তন প্রয়াসের পূর্ববর্তী প্রাথমিক ধাপ হওয়া উচিত—অতীতে গৃহীত নীতি, কর্মপন্থা ও পদক্ষেপগুলোর একটি গভীর যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও বর্তমান প্রয়োজনের নিরিখে তার যথাযথ মূল্যায়ণ। বিজ্ঞাননীতি ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এটা সমান প্রযোজ্য বলেই আমাদের বিশ্বাস।

পূর্ব-নির্দেশিত মানদণ্ডের ভিত্তিতেই আমাদের পত্রিকায় ভারতীয় বিজ্ঞাননীতি বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগরীতি ও অভিমুখ সম্পর্কে আমরা আলোচনার চেষ্টা করেছি বারবার। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞাননীতির উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তনের ধারাটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। ঔষধশিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞাননীতির ক্ষতিকর প্রকাশগুলো আমরা চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছি পরপর প্রকাশিত কয়েকটি লেখায়। C S I R পুনর্গঠন প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম ও প্রধান আপত্তির বিষয়ই হল ব্যাপক বিজ্ঞানীদের মতামতের

প্রতি চরম সরকারী ঔদাসীন্য ও পদ্ধতিগত অগণতান্ত্রিকতা। কারিগরী আমদানী সংক্রান্ত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা চোখধাঁধানো স্বল্পমেয়াদী স্বার্থের কাছে কিভাবে বিপন্ন হয়েছে ক্রমাগত, শর্টকাট দিয়ে কিভাবে লক্ষ্যপূরণের ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে আগাগোড়া।

অত্যন্ত দুঃখের কথা—আজও আমরা একই ভুলের, একই অসঙ্গতির শিকার। প্রমাণ—১৯৭৮-৮৩ সালের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত খসড়া দলিল—যার একটি মূল্যায়ণ আমরা বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করছি। পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চীনের বিজ্ঞাননীতি ও বিকাশের বিকল্প পথটি তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্নক্ষেত্রে বিজ্ঞানগবেষণার সঠিক অভিমুখ সম্পর্কে আলোচনায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট আগ্রহী—নৃতত্বগবেষণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখাটির প্রকাশনা তারই প্রতিফলন।

পরিশেষে, আনন্দ ও উৎসাহের কথা এই যে অবিধিবদ্ধ স্বয়ংশাসিত বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানগুলিতে 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্কের অবসানকল্পে আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে—তারই প্রস্তুতি হিসেবে আগামী সেপ্টেম্বরে আহূত সম্ভাব্য সম্মেলনের সাফল্য আমরা কামনা করি।

Science and Technology in 'Draft Five Year Plan 1978–83'

[ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত খসড়া দলিলের একটি মূল্যায়ণ এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে। অতীতের, বিশেষত পঞ্চম যোজনায় গৃহীত নীতি ও কর্মসূচীর সাফল্য-ব্যর্থতার একটি বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনার এই দলিল তৈরি হ'ল কেন এটাই লেখকের প্রথম প্রশ্ন। অগ্রাধিকারের প্রশ্নে দলিলে প্রতিফলিত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিকতা সম্পর্কে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন লেখক। ক্ষেত্র বিশেষে প্রস্তাবিত ব্যয়মাত্রা এবং সম্ভাব্য উপকার লাভের ঠিকমত হিসেব-নিকেসও করা হয়নি বলে লেখকের ধারণা। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণসহ এ বক্তব্যগুলিই বর্তমান প্রসঙ্গে তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছে।

The Science and Technology (S & T) plan, as formulated in the 'Draft Five Year Plan 1978-83' (hereafter referred to as 'Draft') is a most cursorily prepared document and, as such, does not allow us to make an in-depth analysis of the S & T efforts envisaged in the sixth plan. The *most fundamental defect* of this document is that it has put forward a plan for *outlay* of a very substantial amount of resources (a total of Rs. 2,491 Cr. including plan and non-plan outlays) without any serious effort at the *evaluation* of benefits or results accruing or likely to accrue from the outlay in the S & T sector in the last plan. Resources of our country are SCARCE. From the point of view of the people of the country, the planners have *no right* to allocate huge sums of money into channels whose efficiency and utility are already under severe question and criticism in the context of our country's present economic position. Why, for instance, have atomic energy and space research been allotted the fantastic sum of Rs. 756 Cr, 30% of the entire plan and non-plan outlays in S & T ? Why has there been a 46% step-up in the plan outlay in these two areas compared to the fifth plan ? What have the empire-like organisations responsible for these two areas of S & T got to offer to the common people of the country except the creation of an elite academic-technocratic class, a continuing if not growing dependence on foreign technology through an excessive concentration of sophisticated techniques, and a large scale diversion of scarce resources from which benefits are expected 'in the long run' ?

No assessment but heavy outlay :
Example of Space research

This is not to say that research and development activities in these two areas should not be undertaken with long-term objectives in mind. But the *necessity* of such efforts does *by no means* justify the 47% *increase* in resource allocation in these fields, the overwhelming importance, amounting to 30% of the total outlay, in these areas. The question will naturally arise as to *how much* should the allocation properly be ? This question, however, cannot be answered from an examination of the Draft, since the Draft is totally silent on precisely those data, those assessments, those evaluations on which a correct estimate of the outlay should be based. In case of space science and technology, for example, the Draft assures us that "The main driving force behind the Indian Space programme continues to be the development of indigenous competence and technological base for using space systems, in the areas of communication and remote sensing with applications in meteorology, water management and in the survey of natural resources in general". As regards the assessment of work in the last plan in this area, "Indigenous capability for design and development of rockets, launch vehicle systems and related propellants, design and fabrication of satellites, and test facilities commensurate with the needs of rocketry and satellite development have been built up". This assessment leaves a gaping doubt as to what has actually been 'built up'—the rockets satellites etc. as such, or the 'capability' to design and develop these things. It is most probably the 'capability' that has been built up, for it has been known for quite some time that the programme of launching the first two 'Indian' satellites has been undertaken in Russia. According to the Draft, the 'main driving force' of the sixth plan will 'continue to be' the development of such 'indigenous competence'. And a total of Rs. 336 Cr. has been earmarked for providing this 'driving force'.

> "Such expensive aspirations to technological grandeur are callous in the face of the extreme poverty of the mass of the people in India. The "Approach" (NCST Document) proposes vast programmes to discourage people from having children, while simultaneasly envisaging large scale use of resources for space research to close the technological gap between the West and India and also to promote the production of ceramised glass and many "sophisticated materials" when over two thirds of the population live very poorly in small and often isolated villages"—Peter Bauer : MINERVA Vol XV, No 2, Summer 1977 p. 145.

This is not an isolated example. Neither in case of space science, nor in case of atomic energy, nor in any other area of application of science and technology has there been a proper assessment of past performances and bottlenecks in order to decide on the outlays necessary in the respective fields. Have the planners, perhaps, made a separate study of the past performances which they have not been able to include in the Draft for lack of space ? It is *extremely doubtful* whether this has been done. Let us try to explain why.

Reorientation ?

Starting from the Approach to the Science and Technology Plan brought out by NCST in 1973, there has been talk of *reorienting* our S & T activities. Several important *directions* in which the reorientation must take place have also been identified. It has been said, for example, that S & T does not only mean the acquisition of new knowledge and new techniques but the application and diffusion of *exist-*

ing knowledge and techniques down to the most basic level of productive activity, that is, mainly, agriculture. It has been said that a substantial portion of S & T efforts must go towards small scale industries, and to build up a widespread network of 'appropriate technology'. It has been said that the principal thrust in our efforts must be indigenous and self-reliant development of S & T. All these 'matters of principle' have been reiterated quite a few times in the NCST Approach document, in the S & T plan 1947-79, and in the present Draft. But when this is compared with the *pattern of outlay* recommended in the Draft, *no* indication of these basic reorientations is to be found. Reorientations, *basic* reorientations moreover, cannot be brought about without at the same time changing the pattern of outlay. Instead, we find that the outlay is concentrated as in the past into those agencies or institutions which have in the past maintained S & T efforts as an activity of an elite section, which have utilised the huge amounts of scarce resources channelised to them to build up empires and power centres, which have exhibited continued institutional exclusiveness and lack of flexibility preventing the diffusion of S & T efforts down to the lowest strata of productive activity, have frittered away our resources by expanding sophisticated types of research in unduly magnified proportions, and have been instrumental in tagging our S & T efforts with foreign S & T. It is precisely in this respect, in respect of making the S & T plan conform to the new orientation that has been reiterated time and again —conform *in fact* and not in empty protestations— that a critical assessment of past outlays is called for. It is precisely here that one feels the vital importance of a thorough analysis of why and how the past outlays have *failed* to meet the requirements of the nation so as to make a reorientation necessary. And it is through such analysis that a *new* pattern of outlay, conforming to the new orientation is to emerge. Consequently, when one finds *no* substantial alteration of this pattern, the conclusion becomes inescapable that money is being scandalously wasted without adequate assessment of past performances and bottlenecks, that the same old structure of S & T, instead of being drastically altered, is actually being bolstered up in the plan. Five giant organisations, namely CSIR, DAE, DST, ISRO and ICAR cornered, between themselves, 73% of the plan outlay during the last plan. In the present Draft, 67% of the plan outlay and 69% of total plan and non-plan outlays have been earmarked for these five organisations. This shows that there has been no substantial change in the pattern of outlay which continues to be concentrated in the highly centralised, bureaucratic (not to say autocratic), elitist, foreign-oriented organisations, the monopolists in the highly profitable 'industry' of S & T. Is this pattern compatible with the plan of thorough, widespread, mass-based diffusion of knowledge and know-how ? *It is not.*

Example of ICAR :

Take the case of ICAR as an example. While this organisation received 18.8% of the plan outlay in the last plan, this time it has been presented with 21.9% of the plan outlay. And what has been the contribution of this organisation to agriculture, the *most vital* sector of our economy ? It has been instrumental in introducing high-yielding varieties of crops in collaboration with several external agencies and it can rightly claim at least some part of the credit behind the increase in agricultural output. But even to-day it has not undertaken any extensive spot-to-spot survey of soil conditions in order to prescribe the proper inputs for the high-yielding varieties which are exceptionally sensitive to soil

conditions and the quality of inputs. As a result we are now witnessing the unique phenomenon of farmers being *repelled* away from the adoption of the high-yielding varieties which is becoming uneconomic to them. Such surveys do not require much innovativeness, much ingenuity or much sophistication. What they require is *effort* and mass participation. And it is precisely here that ICAR has failed. And the present Draft has utterly failed in giving our S & T a new direction by concentrating on such monopolists in the field of science and technology.

The Energy Sector :

It has been reiterated time and again that utmost attention is to be paid to the energy problem, that unless S & T is properly applied to solve the energy problem, our economy cannot really advance. But here again the Draft reveals a miserable confusion and lack of priority so far as the application of S & T to the energy sector is concerned. S & T output in power, coal and petroleum together amount to a miserable 5% of the total plan outlay. This excludes the in-house S & T efforts of the various producing concerns, but such in-house efforts have been and continue to be insignificant in real terms. In the Indo-Burmah Petroleum company, for example, a meager 3.7% of the total outlay has been earmarked for S & T. Even here, the percentage figure is misleading, because the absolute amount of outlay in this and other similar organisations is so paltry and is scattered into so many fragments that such outlays can never end our dependence on foreign know-how in the coal, power and petroleum sector. In this sector a clear-cut ordering of priorities is essential, keeping in mind the short-term and long-term requirements and possibilities. Coal must take precedence so far as the short-run energy requirements are concerned. In the NCST Approach document, such areas of research as the development of efficient methods of utilising low-grade coals have been designated as having primary importance. But the outlay indicated in the Draft does not at all reflect this measure of importance in the production and utilisation of coal. In fact, the objective formulated in the fifth plan of replacing oil and oil products by coal has not been rigorously implemented. The consumption of oil products, after remaining stationary in relative terms for a few years after 1973, has started picking up since 1976. Oil products provide now half of the commercial energy produced in the country. This shows that there is no serious, urgent and whole-hearted effort to increase the utilisation of coal. The lack of priority in S & T efforts in coal production and utilisation is just an indication of this fact. In absence of such efforts, and in the absence of any serious effort in the past to thoroughly utilise our hydel power generation potentiality, the deleterious short-term dependence on oil is continuing, and this urgent repuirement of oil is being utilised as an excuse for continuing our dependence both on external supplies of oil and on imported technology in the field. The *only* way to reduce this dependence is to *ease off* the short-term demand of oil through the use of coal and hydel power and to utilise the opportunity provided by the relatively slack demand to explore for deposits of oil and natural gas and to utillse those deposits on *strictly indigenous* know-how. This is a field where dependence on foreign know-how is causing irrepairable loss to the country, forcing us to hand over a substantial portion of *our own* deposits of this invaluable asset to the foreign suppliers of technology. As an illustration we may recall the agreement made in May 1974 with two US firms (the Reading and Bates group and the Carlsberg group) in accordance with which the

companies will be allowed to take away a total of 61% of oil produced from two oilfields as their profit and technical fees (Science To-day, August 1974). In a similar manner a sustained and self-reliant effort to develop nuclear power technology, especially the Fast Breeder Reactor know-how is essential in the atomic energy sector and foreign collaboration is to be avoided at all costs in this field. Instead, massive outlays have already been made in this area with the expectation of quick results which have inevitably increased our dependence on external know-how and raw materials and inordinately delayed the development of indigenous FBR technology which alone can make us self-sufficient in this area. In respect of a yet longer term programme, fundamental and applied research in nuclear fusion power technology has not been promoted in a self-reliant manner with the importance due to this field. A sense of defeatism prevails in respect of self-reliant development of FBR and fusion power technologies, as a result of which there is no sign of our developing a self-sufficient energy sector in the long run.

Meager allocation in important areas :

Similar is the case of other sectors. In fertiliser, the country continues to be heavily dependent on foreign capital and foreign know-how. A meager Rs. 16. 98 Cr (1% of the total plan outlay) has been earmarked for the *entire* chemicals sector, which, including fertilisers, is a key sector of our economy. In spite of the fact that reckless and unscientific use of chemical fertilisers is dangerously affecting soil productivity, and in spite of repeated protestations that decentralised and widespread use of organic manures will be promoted, the Draft has not laid down any concrete formulation regarding the necessary S & T activities. The paltry allotment for S & T in the chemicals sector is sure to continue our almost total dependence on foreign know-how in the chemical and pharmaceutical industries. Other key sectors like heavy industries, health, etc. have received similarly paltry allotments, all due to the fact that a few giant organisations have cornered the lion's share of the total outlay.

In this manner, the entire Draft betrays an apalling lack of concern regarding the actual implementation of the declared objectives of our S & T plan. It has pompously pointed out that there has been a 'growing concern that benefits of science and technology have not reached the ordinary man, but have mostly accrued to the upper echelons of society' and that "one knows that in the absence of continuous monitoring, programmes often get distorted at the implementation level." But it has not laid down any new framework in order to rectify this failure, and has itself ignored the task of summarising the results of the all-important 'continuous monitoring' when such a thing was absolutely essential. It has continued to lay undue emphasis on and to channelise undue amounts of resources to sophisticated S & T efforts without allowing such efforts to grow in a slow but steady manner based on indigenous know-how. As formulated, it will help to maintain the pressing 'demands' of these sophisticated S and T efforts by not properly utilising alternate resources and methods necessitating less sophisticated S and T efforts. In turn, this will mean lesser amounts of resources being available for those types of activity like rural health programme, extensive soil survey, extensive use of organic manure, which demand not new R and D but mainly widespread diffusion of known techniques.

Continuing dependence :

Simultaneously, it will help in continuing our

dependence on foreign know-how. After parrot-like reiterating of all the known phrases regarding the necessity of developing indigenous S and T, the Draft hastens to add, "Technology would have to be imported in those sophisticated and high priority areas where Indian skills and technology are not adequately developed" thereby opening the door to forign technology in vital sectors of the economy. It is precisely in the high priority areas where import of foreign technology is to be *banned.* The Draft is absolutely silent as to how this is to be done. It does not at all point out that in the past the import of foreign technology has been promoted precisely on these two excuses, namely that 'sophisticated and high priority' areas were involved and that indigineous know-how was not 'adequately developed'. It does not point out that unless *protection* is offered to indigenous technology, unless explicit *preference* is exhibited towards it even when it is not 'adequately developed' compared to foreign technology, unless quality is *sacrifised* for the time being, giving a chance to indigenous technology to prove itself, unless all this is done, the sophisticated and high priority areas will continue to be bottlenecks *impeding* the development of our S and T as well as our entire economy,

But then, the S and T plan cannot but reflect the trends and attitudes that rule the country.

A. Lahiri

চীনের নতুন বিজ্ঞান-নীতি

[Reports are appearing on the recently organised convention in China on Seience Policy, in whieh a very large number of persons participated. Some noteworthy features of the outcome of the convention have been highlighted here. This has been done in the general background of Science and Technology as practised in China. The achievements in Science and Technology in China through mass participation have been briefly reviewed. The new trends emerging in the recent convention have been commented upon. Further material / comments on Chinese Science Policy are invited from readers.]

ভারতে কিংবা পাশ্চাত্য দেশে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞানীদের নানা সম্মেলন আকছারই অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। মুষ্টিমেয় লোক তা নিয়ে মাথা ঘামান। কিন্তু চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিলে পিকিং-এর গ্রেট হল অফ দি পিপ্‌লে-এ মাসখানেক ধরে যে বিশাল বিজ্ঞান-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল, কোটি কোটি চীনবাসীর কাছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। বিদেশের নানা মহলেও, বিজ্ঞানীমহলেও তো বটেই, তা নিয়ে যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আহূত সম্মেলনকে সফল করার জন্য বেশ কিছুকাল ধরেই চীনে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল। ....বিভিন্ন জাতির ৬০০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে আট বছরের (১৯৭৮-৮৫) জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক একটি খসড়া জাতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনাটি নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আট বছরের মধ্যে পেশাগত বিজ্ঞানীর সংখ্যা আট লক্ষে উন্নীত করার এবং উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাসহ গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার নীতি যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি উচ্চতর পড়াশুনার ক্ষেত্রেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, এগ্রিকালচার, এনার্জি, মেটিরিয়ালস, কম্পুটার, লেজার, স্পেস, হাই-এনার্জি ফিজিক্স ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই আটটি ক্ষেত্রের উপর প্রাধান্য দিয়ে মোট ২৭টি বিষয়ে (discipline) ১০৮টি প্রকল্পকে বেছে নেওয়া হ'য়েছে। ক্ষেত্রগুলির নাম শুনেই অবশ্য মনে করবার কারণ নেই, যে চীন উন্নত পশ্চিমী দেশগুলোকে অন্ধ অনুকরণ করতে উদ্যোগী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় স্পেস ও হাই-এনার্জি ফিজিক্সে গবেষণা পরিচালিত হবে যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে ; বতকগুলি রোগের চিকিৎসার জন্য এবং জৈব পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের লক্ষ্যে নিয়োজিত হবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর গবেষণা। বিজ্ঞান-

নীতিকে এভাবে ঢেলে সাজিয়ে এই শতকের মধ্যে উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হওয়া বা ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ছাড়িয়ে যাওয়াই চীনের সামগ্রিক লক্ষ্য।

আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে পাশ্চাত্য দেশে চীনের এই বিজ্ঞান সম্মেলন যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকাগুলি, বিশেষত নেচার (NATURE), চীনের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে নানা নিবন্ধ ও রিপোর্ট প্রকাশ করেছে (নেচার ৮ ডিসেঃ, ১৯৭৭, ৬ এপ্রিল ১৯৭৮ সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য), তুলনায় আমেরিকান পত্র-পত্রিকাগুলি প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। নেচার ও অন্য একটি ব্রিটিশ পত্রিকা 'নিউ সায়েন্টিষ্ট' (৩০ মার্চ, ১৯৭৮ সংখ্যা)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী চীনের বিজ্ঞান-নীতির নতুন উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হ'লঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান গবেষণার প্রতি আগ্রহ, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাকে প্রায় আগাগোড়া পেশাগত করার প্রয়াস, বাইরের দেশের সঙ্গে যৌথ গবেষণার ইচ্ছা, এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকা প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় ব্যবহারের সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিবিজ্ঞানীর স্বীকৃতি, সম্মানসূচক ডিগ্রী পুরস্কার প্রবর্তন ইত্যাদি। আসল কথা হল, মাও সেতুং-এর মৃত্যুর পর তথাকথিত 'চারচক্রের' সমস্ত কুপ্রভাব থেকে চীনকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা ইদানিং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চলেছে, বিজ্ঞান নীতির নবরূপায়ণও তারই একটি অঙ্গ। তাই শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিচারে চীনের নতুন বিজ্ঞাননীতি কারও কাছে অভিনন্দনযোগ্য, আবার কারও কাছে নিন্দনীয় হ'তে পারে।

কিন্তু বর্তমান চীনে বিজ্ঞানের অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রাখলে বিচারে একটা ফাঁক থেকে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। সেদিকটায় একটু চোখ বুলানো যাক।...বিগত কয়েকদশক ধরে, বিশেষতঃ ১৯৬২ তে রাশিয়া হঠাৎই সাহায্য বন্ধ করার পর, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চীন নিজস্ব পথ ধরে চলার চেষ্টা করেছে। ভেল্কি দেখানোর প্রবণতা ত্যাগ করে, একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার জন্য বিজ্ঞানের সুফলকে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে চীন যে অনেকখানি সফল হ'য়েছে, তা আজ অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারে না।....যুগ যুগ ধরে অপুষ্টি ও মহামারীর শিকার চীন আজ আর রোগজীর্ণ নয়। হাসপাতালগুলিকে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে আকুপাংচার ইত্যাদি প্রাচীন পদ্ধতির সমন্বয়ের পন্থা তারা আবিস্কার করেছে। যেখানে যার যতটুকু অবদান সংশয়াতীত, সসম্মানে তাকে সেখানে স্থান দেওয়ার পথ অনুসৃত হচ্ছে। সিফিলিস, রক্ত-চোষা কৃমি (Schistosomiasis) ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তির জন্য গণসমীক্ষা (mass survey) ও জন-চেতনার পথকে তাঁরা কাজে লাগাতে পেরেছেন। সাংঘাতিক ভাবে পোড়া ঘা সারাতে বা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে চীন বিস্ময়কর সাফল্যের অধিকারী। গ্রামের লোকদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন মেটাতে চীনের 'বেয়ারফুট ডাক্তার' নামধারী পার্টটাইম চাষী-চিকিৎসকরা প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন। ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় সুপরিচিত জটিল রাসায়নিক প্রোটিন 'ইনসুলিন' সংশ্লেষণ করে চীন সমস্ত উন্নত দেশের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছে। (দ্রঃ 'অ্যাওয়ে উইথ অল পেষ্টস'—ডাঃ জোস্থয়া হর্ন)

শিল্পের ক্ষেত্রে চীন বেছে নিয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পথকে যেখানে সাধারণ চীনা কারুবর্গের (Craftsman) হাতুড়ী ছেনা বাটালিকেও তাঁরা করে তুলেছে সৃজনশীল। তারা বুঝেছেন উন্নত কারিগরী নির্ভর বৃহৎ শিল্পের পথ হল পরনির্ভরতার পথ। কোটি কোটি চীনবাসীর শ্রমে ও প্রেরণায় হাজার হাজার ছোট শিল্প ইউনিট গড়ে তুলে কিংবা রাস্তা, ক্যানেল, বাঁধ, সেতু তৈরী করে, চীন নিজেকে করে তুলেছে আত্মবিশ্বাসী। ....ভারত যেখানে ১৯৫০ সালে ৩ কোটি টন থেকে কয়লা উৎপাদন বাড়িয়ে ১৯৭৫ সালে প্রায় ১০ কোটি টনে পৌঁছেছে, সেই একই সময়ে চীন প্রায় ৩০ লক্ষ টন থেকে পৌঁছেছে ৪০ কোটি টন-এ। এর এক তৃতীয়াংশের বেশী উৎপাদন হ'চ্ছে হাজার হাজার ছোট ছোট পুকুর খনি (open-cast-mine) দ্বারা। বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা যেখানে প্রায় পুরোপুরি বৃহৎ ও বিদেশী শিল্প-নির্ভর, চীন সেখানে এক তৃতীয়াংশ (প্রায় (২৫০০ মেগাওয়েট) বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট ৬০,০০০ এরও বেশী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে।....এমনকি সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য সরল ছোট ষ্টোভ অচিরেই লাখে লাখে তৈরী করার পথও হ'য়েছে প্রশস্ত।.....১৯৫৮ সাল নাগাদ চীনে যে লোহা-গলানোর বহিরাঙ্গণ চুল্লীর (Backyard furnace) ঢেউ উঠেছিল, যা নিয়ে খোদ চীনেও বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে, বাইরের দুনিয়ার হাসাহাসিতেও কমতি ছিল না, ভুলভ্রান্তির পর্ব পেরিয়ে সেই প্রয়াস আজ চীনকে পৌঁছে দিয়েছে হাজার হাজার গ্রামীণ কমিউনে অত্যুৎকৃষ্ট বিশেষ সংকর ইস্পাত তৈরীর ক্ষমতায়। এই ভাবেই চীন ১৯৭৫ সালে মোট রাসায়নিক সারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, সিমেন্ট উৎপাদনের প্রায় অর্ধাংশ তৈরী করেছে ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানায়।

(দ্রঃ 'স্মল ইজ বিউটিফুল'—ই. ই. স্মমাচার, 'রুরাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন ইন চায়না'—জে. সিওর্ডসন ও 'ইণ্টারমিডিয়েট এনার্জি টেকনোলজি ইন চায়না'—ভি. স্মিল, ইকনমিষ্ট, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

অর্থাৎ শিল্পে ও কৃষিতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও জনস্বাস্থ্যে রাস্তাঘাট-সেতু-আবাস তৈরীতে চীন একটি নজির। চীনের বিশাল বাজার তাবড় তাবড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দীর্ঘশ্বাসের কারণ হ'য়েছে অথচ চীন হীনবল হয়নি। এই পরম সত্যের অন্তর্নিহিত সারবস্তুটি হ'ল এই যে অগণিত দেশবাসীর উদ্যম ও ক্রিয়াকাণ্ডকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্মুক্ত করে কাজে লাগাবার কৌশল করায়ত্ব করছে চীন।

এই পটভূমিতে চীনের নতুন বিজ্ঞাননীতি ও পরিকল্পনা কি সত্যিই

পাশ্চাত্যমুখী হ'য়ে উঠবে নাকি তাদের বিবিধ অগ্রগতিকে আরও সংহত করবে, চীন কি নিজেকে নতুন করে বৈজ্ঞানিক উপনিবেশে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করবে নাকি সে চাপকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে নিজেকে উন্নীত করবে নতুন এক লক্ষ্যে, তা দেখবার জন্য ভবিষ্যতের দিকে আমরা সবাই তাকিয়ে থাকবো। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৭৮-এর বিজ্ঞান সম্মেলনে জনৈক সরকারী মুখপাত্রের উক্তি: চীনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ হ'য়ে থাকে শিক্ষিত বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের উদ্যোগে। এমনটি কোন (পাশ্চাত্য) দেশই করেনি বা করতে পারে না। এমন বিশাল গণ-আন্দোলন অফুরন্ত সৃষ্টিশীলতা উন্মুক্ত করবে।...চীনের চেয়ারম্যান হুয়ার কথায়—চীন চায় 'সমাজতান্ত্রিক আধুনিকতা' যা এখনও কেউ দেখে নি। কিন্তু তবুও একথা অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চীন যেসব নতুন ব্যবস্থা নিতে চলেছে তা এতদিনের অনুসৃত পথ থেকে নিঃসন্দেহে অনেকটাই আলাদা। এর ফল কি হবে তার একমাত্র উত্তর দিতে পারে ভবিষ্যৎ।...মোটকথা, চীনের সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী জনগণ তাঁদের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী; তাঁদের ভবিষ্যৎ তাঁরাই নির্ধারণ করবেন এবং সঠিক ভাবেই। আমাদের শুধু ভাববার—দশলক্ষাধিক ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী কি আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'তে পারবে?

রবীন মজুমদার

ভারতীয় নৃতত্ত্ব গবেষণা কোন পথে?

[The author, in this article, deals with what the nature of anthropological studies should be, what it has been in India so far and the causes of discrepancy between them. It has further been suggested that anthropological studies should be relevant to the major social problems of India, and specifically, be concerned with fighting ill-health and regressive mental orientation. The paper was read in the Indian Science Congress in 1977 held at Bhuvaneswar and is being published here in a slightly abridged form translated from the English original.]

এ লেখাটির মূল ভিত্তি হ'ল একটি অনুমান যে কলা, সাহিত্য, রাজনীতি তথা অন্যান্য পেশার মত বিজ্ঞান গবেষণাও একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত—যার লক্ষ্য হল মূলত মানবকল্যাণ। এই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এখানে কোন নতুন যুক্তি উপস্থাপনা করা হয়নি—বরং এটিকে স্বতঃপ্রত্যক্ষ হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটেই এখানে (নৃতত্ত্বগবেষণায়) আমাদের অতীত ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ণ ও ভবিষ্যৎ ভূমিকা নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে এবং এ দুয়ের মধ্যে যে গরমিল তা দূর করবার জন্যেই গরমিলের কারণ কোথায় খুঁজে বের করারও চেষ্টা হয়েছে। ব্যক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের আলোচনার বেশিরভাগটাই সীমিত থাকবে জৈবিক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে।

সুনির্দিষ্ট বিষয়ে যাবার আগে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল মানুষ ও প্রকৃতির, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক (গুলো) অনুধাবন করার চেষ্টা করা এবং একমাত্র না হলেও মূল লক্ষ্য হল সেই লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো। একটি নির্দিষ্ট সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, জনশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ প্রভৃতি নানা বিষয় বিবেচনা করেই বিভিন্ন ধরণের গবেষণার মধ্যে অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি স্থির করতে হয়।

মানবসমাজের বিকাশ কথাটি এত ব্যাপ্তিময় যে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। চলতিকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও তার সমাধানের দিকে দৃষ্টি রেখেই ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় একে বিচার করতে হবে।

বর্তমান সময়ের ভারতীয় সমাজের প্রধান সমস্যা হ'ল এই যে জনগণের এক 'শক্তিমান সংখ্যালঘিষ্ঠ' অংশই কেবল টিঁকতে পারছে এবং বৃহত্তর "মূক সংখ্যাগরিষ্ঠ" মানুষের জীবনের মূল্যে তারাই ক্রমাগত বিকশিত হয়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চলের এই শক্তিমান প্রভুত্বকারী অংশ হল সামন্তপ্রভুরা, দাদনদার, স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল। অনেকসময় এদের একজনকেই তিনের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। গরীব চাষী, ছোট ব্যবসায়ী ও যন্ত্রনির্মিত পণ্যসমাগমের দরুণ কর্মচ্যুত কারিগরশ্রেণীর ওপর এবং স্থানীয় রাজনীতিতে এদের দোর্দণ্ড প্রতাপ আজও অক্ষুণ্ণ—যার ফলে স্থানীয় প্রশাসনকে এরা প্রয়োজনে ব্যবহার করে বা নিষ্ক্রিয় করে রেখে দেয়। আর শহরাঞ্চলে ক্ষমতাবান অংশ হ'ল গ্রামে-না-থাকা জমিদারবর্গ, পুরোনো ঐতিহ্যের ধারক শহুরে অভিজাত সম্প্রদায়, বৃহৎ-

ব্যবসায়ী ও বিদেশী বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধিদের মিলিত চক্র। তারাই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ ছোট ব্যবসায়ী, অফিসকর্মী, শিক্ষক-সম্প্রদায় প্রভৃতির ওপর কর্তৃত্ব করে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

এই বিরাট সমস্যাসমাধানের সূত্র হল নিম্নরূপ :

(ক) বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক সামাজিক / রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করা।

(খ) উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রসার ঘটিয়ে এবং খাদ্য, ঔষধ প্রভৃতির উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটিয়ে জনগণের দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ লাঘব করা (স্বল্পমেয়াদী ইতিবাচক ব্যবস্থা)।

(গ) নির্দিষ্ট অঞ্চল ও জনসমষ্টিগুলির মধ্যে দারিদ্র্য ও দুর্দশার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা, জনগন এবং বিভিন্নবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এ সংক্রান্ত সমস্ত পরামর্শগুলো সংগ্রহ করা, সংশোধন ও অনুমোদনের জন্য সেগুলো আবার জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া। জনগণকে এ সমস্যাগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত করা এবং গোটা প্রক্রিয়াটিকে যথাসম্ভব ব্যাপক করে তোলা (দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক ব্যবস্থা)।

(ঘ) অবৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতি, 'গুরু'-কুল, 'রাজনৈতিক দাদা'বৃন্দ ও কর্তাব্যক্তিদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সব নীরবে সয়ে যাওয়ার মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো (দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক ব্যবস্থা)।

যদিও সমস্যার সবচেয়ে কার্যকরী এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হল বিরাট সামাজিক / রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সমাজ-কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন ঘটানো তবুও এ পন্থা গ্রহণ পেশাগতভাবে ব্যাপক বিজ্ঞানকর্মীদের সাধ্য ও সীমার বাইরে। যাইহোক, তা হলেও জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখার চিন্তা, চেতনা, পদ্ধতি ও ভাবসম্পদগুলোকে দারিদ্র্য ও দুর্ভোগনিরসনের নানাদিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা তাঁদের কর্তব্য। স্পষ্টতই [দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের] এই নানা দিকগুলো আসলে শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থারই ফল—কখনই তার কারণ নয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করলেই সমস্যাটি স্থায়ীভাবে লোপ পাবেনা। তৎসত্ত্বেও স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র আশু ব্যবস্থা হিসেবে বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হল।

এবারে উপরে প্রদত্ত মাপকাঠিতে আমরা নৃতত্ত্বের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথমত, সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজনৃতাত্ত্বিকদের সমাজপরিবর্তনের গতি বিশ্লেষণ ও পরিবর্তনের অভিমুখ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবার অনুমিত ক্ষমতার কথা বাদ দিলেও একথা মনে হয় ঠিক যে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল—তাঁরা সমাজের পশ্চাৎপদ শ্রেণীগুলোর সাথে সহজে মেলামেশা করতে পারেন এবং নানা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন। সংগৃহীত তথ্যগুলো সমাজের দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের মাত্রা নির্দেশের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেই মাত্রাগুলো হ'ল জীবনধারণের মান, পুষ্টিসীমা, সাধারণ স্বাস্থ্য ; আর তাদের মাপকাঠি হচ্ছে জন্মপূর্ব ও জন্মপরবর্তী মৃত্যুহার, স্বাস্থ্য, শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশ, রোগাক্রমণের রকমসকম প্রভৃতি নানা বিষয়। সমস্যার গুরুত্ব নির্ণয়ের অর্থ সমস্যা সমাধান নয় একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে দুটো কারণে এটা নিঃসন্দেহে একধাপ অগ্রগতি। কারণগুলি হল : (ক) সুনির্দিষ্ট তথ্যের সাহায্যে বিভিন্নস্তরে সমস্যার ব্যাপকতা নির্ণয়ের সম্ভাব্যতা (খ) এমন কি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সমাজকাঠামোর ক্ষেত্রেও কার্যকরী কর্মসূচী প্রণয়নে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা।

তাছাড়া উপযুক্ত স্বল্পমেয়াদী শিক্ষণ মারফৎ নৃতত্ত্ববিদরা সাধারণ ছোটোখাটো রোগচিকিৎসার কাজ চালাতে পারেন, নিয়মিতভাবে পালনীয় স্বাস্থ্যবিধিগুলো সম্পর্কে প্রচার করতে পারেন এবং দূর গ্রামাঞ্চলে চীনের 'নগ্নপদ চিকিৎসক'দের মত সাধারণ চিকিৎসক বা আধাচিকিৎসক-বাহিনী গঠনের জন্য স্থানীয় যুব সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। বিশেষ করে গ্রামের দিকে বর্তমানে চিকিৎসক সঙ্কট চরম। সেখানে বেশির ভাগ অসুস্থতাই আসলে অতি সাধারণ ধরনের এবং স্বল্পশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় যুবকরাই তা স্বচ্ছন্দে সামলাতে পারেন। এ ধরনের শিক্ষণব্যবস্থা ও সাথে সাথে সার্ভে ধরণের কাজ পরিচালনা করে নৃতত্ত্ববিদরা সমাজ-জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন—অবশ্য তার আগে নৃতত্ত্ব-বিদদের নিজেদের শিক্ষণ ব্যবস্থায়ই জৈব-চিকিৎসার অভিমুখ সৃষ্টির উপযোগী পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, দেশীয় প্রাচীন ঔষধপত্রের ব্যবহার, স্থানীয় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রভৃতিকে কাজে লাগানো সম্পর্কিত নানা সমস্যা ও তা সমাধানের সম্ভাব্য পথ সম্পর্কে স্থানীয় ভুক্তভোগী জনসাধারণের অভিমতগুলো খুব যত্নসহকারে সংগ্রহ করা নৃতত্ত্ববিদদের কর্তব্য। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতসহ সেই সংগৃহীত তথ্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুসারে আলাদা আলাদা করে শেষবারের মন্তব্যের জন্য সেগুলো আবার জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। এ ধরণের "জনগণ থেকে নিয়ে জনগণের কাছে পুনরায়ণের" নীতি ও কর্মপন্থা শুধু যে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করবে তাই নয়—সাথে সাথে সীমিত সম্পদের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহারে জনসাধারণের অংশগ্রহণকেও সম্ভব ক'রে তুলবে।

তৃতীয়ত, শ্বেতকায় বা উঁচু জাতি সমূহের উৎকর্ষ সংক্রান্ত অযৌক্তিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে নৃতত্ত্ববিদদের সংগ্রাম করা উচিত। একথা বিশ্বাস করবার কোন যুক্তি নেই যে বড় বড় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মেধাগত পার্থক্য সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণা আপনা আপনি লোপ পেয়ে গেছে।

বরং সম্প্রতি তা আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, সম্প্রতি বলা হচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে মানুষের বুদ্ধি, সামর্থ্য, কীর্তি, ব্যর্থতাসহ সবরকমের সামাজিক চরিত্রই হ'ল সোজাসুজি (মানবদেহের) জীনবাহিত বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিফলন; এমন কি সম্পদের উত্তরাধিকারও, একটি অংশের বিচারে, জীনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জীনগত পার্থক্যের সত্যতা ও জীনগত বৈশিষ্ট্যের অপরিবর্তনীয়তা সংক্রান্ত ধারণার সাথে এই অভিমত যুক্ত হয়ে ব্যাপারখানা দাঁড়ায় এরকম যে বিভিন্ন শ্রেণী-বর্ণ-ধর্মের মানবসমষ্টির মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের ঘটনাটি জীববিজ্ঞানগত ভাবেই পূর্ব নির্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং এ পার্থক্য দূরীকরণের চেষ্টা বৃথা। নৃতত্ত্ববিদদের এই পূর্বনির্ধারণবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অসমান সুযোগসুবিধাই অর্জিত কীর্তিভেদের জন্য দায়ী—তা মোটেই জীনগত পার্থক্যের ফল নয়।

শেষত, নৃতত্ত্ববিদদের নিজ নিজ আন্তর পছন্দের ক্ষেত্র অনুযায়ী মৌলিক গবেষণা করবার স্বাধীনতাও কিছুটা থাকা প্রয়োজন—যাতে তাঁরা তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। অবশ্য এ ধরণের গবেষণাগুলোর গভীর শিক্ষাগত মূল্য থাকা দরকার এবং এতে সহজ পন্থা বর্জনই বাঞ্ছনীয়। একটু প্রসঙ্গান্তরিত হয়ে বলা যেতে পারে যে "জৈবিক/জীনগত দূরত্ব" পরিমাপমূলক যে ধরণের গবেষণা আজকাল খুব হালফ্যাশনের হয়ে দাঁড়িয়েছে তাও যতক্ষণ না নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক অনুষঙ্গকে পর্য্যালোচনা ক'রে করা হচ্ছে—এবং যা সাধারণতই করা হয় না—ততক্ষণ তার শিক্ষামূল্য যথেষ্ট নয়।

নানা কারণে অনেকে উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলো গ্রহণীয় নয় ব'লে বিবেচনা করতে পারেন। তাঁরা একে বিদেশিয়ানা বলে ভাবতে পারেন, প্রশ্ন করতে পারেন "নৃতত্ত্ববিদকে কি অবশ্যই সমাজসেবী হ'তে হবে?" অথবা পক্ষান্তরে "চিকিৎসা সংক্রান্ত সমাজসেবামূলক কাজ বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মত ছোটখাটো কাজ ক'রেই কি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বদলে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব?" প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে মধ্য-বা-উচ্চবিত্ত অবস্থানের জন্য ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদরা তাঁদের জীবনে অনেকের মূল্যে এমন সব স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছেন যাতে জনগণের কাছে আজ তাঁদের ঋণশোধের আবশ্যিক দায়িত্ব রয়েছে; দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে নৃতত্ত্বগবেষণা নিশ্চয়ই সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রকৃষ্টতম পন্থা নয় এবং পেশাগত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ক'রে নৃতত্ত্ববিদরা খুব বেশীর পক্ষে যৎসামান্য অবদানই রাখতে পারেন। সেই সামান্য অবদানেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, না তাঁদের পেশাগত চৌহদ্দির বেড়া ডিঙ্গিয়ে দেশের সামাজিক/রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা উচিত তা নৃতত্ত্ববিদদের যার-যার ব্যক্তিগত বিবেকের ওপর ন্যস্ত করাই সমীচীন।

জৈবিক নৃতত্ত্বগবেষণার বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে একটি ব্যাপারে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে গত একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওপরে-বলা অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলোতে বাস্তবিক কোন কাজই হয়নি।

বেশির ভাগ গবেষণাই পরিচালিত হয়েছে কতকগুলি জৈবিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়—এক বা একাধিক আদিম কঙ্কাললব্ধ মানবগোষ্ঠি বা তাদের আধুনিক প্রগতিসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য পর্য্যালোচনায়। প্রথম দিকে মেট্রিক বা মরফোলাজিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—পরে এসেছে রক্ত ও চর্মবৈশিষ্ট্য—তারও পরে আসে প্রোটিন ও এনজাইম পলিমরফিজম্ সংক্রান্ত গবেষণা। ক্রমশ বেশি বেশি মাত্রায় জটিল সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে। বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে পুরুষানুক্রমে নেমে আসে সে সম্পর্কেও গবেষণা হয়ে থাকে—কখনও কখনও কানের লোমের ঘনত্ব বৈশিষ্ট্যের মত ছোটখাটো অর্থহীন বিষয়গুলোও বাদ যায় না। '৬০ এর মধ্যভাগ থেকে আদিম ও প্রায়-নিঃশেষিত ছোট জাতিগুলির জনসংখ্যাবিষয়ক গবেষণা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ গবেষণার কথা বাদ দিলে অন্যগুলোর কোনটিরই সমাজের ক্ষেত্রে কোন প্রান্তিক প্রাসঙ্গিকতাও নেই: (ক) সরকার জোরের সঙ্গে প্রমাণ করেন যে নৃতত্ত্ববিদ্যার উদ্দেশ্য হলো একটি সুস্থ জাতি গঠন (খ) সরকার কর্তৃক বিতর্কমূলক জনসংখ্যাসমস্যা বিষয়ক আলোচনা (গ) মজুমদার এবং রাও দেখান যে বিভিন্ন জাতধর্মের মানুষের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক জৈবিক পার্থক্য নেই যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, অতীতে হয়তো তাঁরা একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল এবং বিভিন্ন জাতি বা জাতের মধ্যে বংশানুক্রমিকতাজনিত পার্থক্যের ধারণা আসলে নিছক কল্পনা।

স্পষ্টতই ওপরে যে আদর্শ অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং চলতি গবেষণার ধারা থেকে যা বেরিয়ে আসছে এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও অভিমুখের মধ্যেই এই পার্থক্যের কারণ নিহিত এবং সেই লক্ষ্য ও অভিমুখ নির্ভর করে তাঁদের সামাজিক অবস্থান, পেশা ও নানা সামাজিক সংসর্গের ওপর।

পরবর্তী অংশে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদদের মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনাচ্ছলে কয়েকটি পরীক্ষনীয় প্রকল্প উপস্থিত করা হচ্ছে—যেগুলো হয়তো ভারতীয় নৃতত্ত্বগবেষণাবিকাশের অদ্ভুত ধারাটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। যথাযথ হিস্টিরিওগ্রাফিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রকল্পগুলোর সত্যতা নিরূপণও সম্ভব।

ভারতীয় নৃতত্ত্বগবেষণায় প্রথম আসেন প্রধানত পাশ্চাত্য গবেষকরা—বিশেষত ইংরেজ শাসকবৃন্দ। নিজেদের দেশে তাঁরা যে ধরণের গবেষণা চালিয়েছেন এদেশে এসেও অনুরূপ চেষ্টাই চালিয়ে যান—যেমন জাতিতত্ত্ব ছিল তাঁদের প্রিয় বিষয়। উপনিবেশবাদী আমেরিকার নৃতত্ত্ববিশারদরা

তার আগেই প্রমাণ করবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে আফ্রিকা থেকে আগত স্থায়ী বাসিন্দা বা নেটিভ ভারতীয়দের তুলনায় শ্বেতাঙ্গরা সবদিক থেকে উন্নততর। সম্ভবত রিসলের মত কয়েকজন উপনিবেশিক শাসক সুযোগবুঝে এই শ্বেত-উৎকর্ষের তত্ত্বটি তখনই ভারতের মাটিতে আমদানী করে থাকবেন। অন্যভাবে বলা যায় যে প্রথমদিকের ঔপনিবেশবাদী শাসক নৃতত্ত্ববিদদের পয়লানম্বর উদ্দেশ্যই ছিল উপনিবেশিক ব্যবস্থা বজায় রাখার যুক্তি উপস্থাপনা। প্রভুর পদসেবার উপযুক্ত করে তুলবার জন্য উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের অন্তত আংশিক শ্বেত / ককেসয়েড রক্তসম্বন্ধের দোহাই দিয়ে নানারকম অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। যতদূর মনে হয় এর ফলে বুদ্ধিজীবীদের ওপর দু'রকম প্রতিক্রিয়া হয়:

(ক) জাতিগতভাবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অষ্ট্রেলয়েড, নিগ্রোয়েড প্রভৃতি জাতিগুলির রক্তের একটি উপাদান রয়েছে আমাদের (ভারতবাসীর) রক্তে এসব প্রমাণ করবার চেষ্টা করে একটি অংশ প্রভুদের প্রচারে সায় যোগান।

(খ) জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত আরেকটি অংশ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন আমাদের রক্তে রয়েছে উন্নত শ্বেতাঙ্গ উপাংশ এবং অশ্বেতাঙ্গ অপাংশ। যেহেতু পাশ্চাত্যমুখিনতায় তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার মূল শেকড় গ্রোথিত তাই শ্বেত-উৎকর্ষ-তত্ত্বের সরাসরি বিরোধিতায় তাঁরাও ব্যর্থ হন।

কালপ্রবাহে এবং আমেরিকার বোয়াস ও ওয়াইল্ডারের শ্বেত-উৎকর্ষ-তত্ত্ব বিরোধিতার সাথে সাথে জাতিবিদ্যায় গবেষণার স্রোতটি ক্ষীণ হয়ে আসে। অবশ্য ভারতীয় নৃতত্ত্ব গবেষণায় তবু কোন নতুন ধারা সৃষ্টি হয়নি এবং সেই পাশ্চাত্যমুখী প্রবণতার অনুকরনই চলেছে যথাপূর্বম্ তথাপরম্—তা সে পপুলেশন জেনেটিক তত্ত্বেই হোক বা অন্য কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগেই হোক। ভারতীয় সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এরকম অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তির কারণগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে নিম্নোল্লেখিত বিষয়গুলোতে:

(ক) পূর্ববর্তী বেশির ভাগ উপনিবেশিক দেশেই যা হয়েছে সেরকম ভারতীয় ক্ষেত্রেও বুদ্ধিজীবী সমাজ পাশ্চাত্যের অপেক্ষাকৃত উঁচুদরের বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত অংশের কক্ষে পাবার চেষ্টা করেছে এবং পশ্চিমী বিদ্বৎ সমাজের কাছ থেকে উৎসাহ, প্রেরণা ও প্রশংসা পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে।

(খ) সমাজ থেকে তাই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং সমাজের সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলো সম্পর্কে রয়েছেন অজ্ঞ।

(গ) নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেই কার্য্যত তাঁরা ব্যস্ত। এমন কি আংশিকভাবে হলেও যখন তাঁরা সমষ্টির কথা ভেবেছেন তখনও সে সমষ্টির গণ্ডীতে এসেছে স্বশ্রেণীভুক্ত উচ্চবর্গের মানুষদেরই স্বার্থ। ফলে ভারতীয় শিক্ষাবিদদের চিন্তা ও কাজের কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিমী দুনিয়া থেকে দেশীয় মৃত্তিকায় স্থানান্তরিত হয়ে এলেও তা খুব কদাচিৎই দেশের 'নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ' মানুষের জীবনের বৃত্তকে স্পর্শ করেছে। আর কোথাও তা করলেও তা হয়েছে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল দমনের উপকরণ বা পরীক্ষাগারের গিনিপিগ হিসেবে—যার মূল্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণাকে জীবনের উচ্চতর ধাপে আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপান হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

নৃতত্ত্ব গবেষণার আকাঙ্খিত লক্ষ্য ও এ যাবৎ অর্জিত সাফল্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দূরীকরণে যা প্রয়োজন তা হল এই শাখায় আগত গবেষকদের চিন্তা ও চেতনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো—যাতে তাঁরা সমাজের সর্বনিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গে সত্যিকারের একাত্ম হতে পারেন, তাদের সমস্যাগুলো বুঝতে পারেন এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন।

এটা আশা করতে ভালো লাগে যে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন ভবিষ্যতের নৃতত্ত্ববিদরা অতীতের এই অনুজ্জ্বল ধারাবাহিকতার গ্লানি ও শৃঙ্খলমুক্ত হবার মত প্রয়োজনীয় শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করবেন এবং এমন একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজগঠনে ব্রতী হবেন যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভিত্তিক বা অর্থনৈতিক অবস্থানজনিত কোন বিভাজন থাকবেনা।

(ইংরাজীতে) মূল রচনা—**অমিত বসু**
অনুবাদ—**সুব্রত ভট্টাচার্য**

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বন্যাত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

রিপোর্ট

বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রীকরণ ও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের অবসানের দাবীতে আন্দোলন

আমাদের দেশে যে সব প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের গবেষণা বা চর্চা হয় তার মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানকর্মীদের কোন আইনগত অধিকার নেই। তাঁদের ওপর কর্তৃপক্ষ কোন অবিচার করলে এমনকি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেও, তাঁরা আইনের কোন সাহায্য পান না। আইনী পরিভাষায় এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্কের নাম হ'লো 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক। স্বয়ংশাসিত (antonomous) আর অবিধিবদ্ধ (non-statutory) প্রতিষ্ঠানগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ (C S I R) এর অধীন গবেষণাগারগুলো এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি এগুলোর মধ্যে কয়েকটাকে বিভিন্ন সরকারী মন্ত্রকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হ'চ্ছে যে তাতেও নাকি কর্মীদের অধিকারের কোনও ইতরবিশেষ হয় নি। C S I R ছাড়াও ভারতবর্ষের বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই অবস্থা। ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারগুলো এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

এ তো গেল ন্যূনতম আইনী অধিকারের কথা। এছাড়াও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে, প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে সাধারণভাবে বিরাজ করছে এক প্রচণ্ড অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। দেশের মানুষের কষ্টে অর্জিত বহু কোটি টাকা ব্যয়ে যা কাজ হয় তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে পরিচালকগোষ্ঠী নামধারী কিছু ক্ষমতাবান চক্র।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭৭ সংখ্যায় আমরা এই অবস্থা নিরসনের জন্য বিজ্ঞানকর্মীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরি। পশ্চিমবঙ্গের কিছু অবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা উদ্যোগ নিয়ে ৮ই মার্চ এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে এক সভা আহ্বান করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পত্রিকার মে-জুন, ১৯৭৮ সংখ্যায় আমরা এই প্রচেষ্টা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলাম।

৮ই মার্চের সভায় ঠিক হয়েছিল আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসাবে এক গণকনভেনশন ডাকা হবে। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এক প্রস্তুতি কমিটি গড়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। তারপর ৫ই মে আগেকার সভার আহ্বায়কদের আর বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে এই প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। এখন এই কমিটিতে র'য়েছেন কলেরা রিসার্চ সেন্টার, সাহা ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স, বসু বিজ্ঞান মন্দির, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার, জুট টেকনলজি রিসার্চ ল্যাবরেটরি, জে. সি. ডব্লু. এ (J C W A) ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রতিনিধিরা। এই কমিটি এখন পর্যন্ত তিনবার মিলিত হয়েছেন।

গত ৭ই জুলাই এই কমিটি বিজ্ঞানকর্মীদের এক সাধারণ সভা ডাকেন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে দাবী করা হয়—

(১) বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের নিরসন চাই; বিজ্ঞানকর্মীদের আইনগত নিরাপত্তা চাই।

(২) বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকমণ্ডলীতে কর্মীদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব মারফৎ এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনায় গণ-তান্ত্রিকতা কায়েম ক'রতে হবে।

(৩) সব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে।

ঐ সভায় ঠিক হয় যে এই প্রস্তাব লোকসভার বিভিন্ন সদস্য ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাছে পাঠানো হবে, যাতে লোকসভায় আসন্ন শিল্পীয় সম্পর্ক বিলে এই দাবী স্বীকৃতি পায়। সেই অনুসারে এই প্রস্তাব বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে পাঠানো হ'য়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবীন্দ্র বর্মা প্রাপ্তী স্বীকার ক'রে আশ্বাস দিয়েছেন যে আসন্ন বিলের খসড়ায় এই দাবী বিবেচিত হবে। এছাড়া ঐ সভায় স্থির হয় যে সেপ্টেম্বর মাসে গণকনভেনশন ডাকা হবে।

প্রস্তুতি কমিটি গত ২৩শে আগষ্ট তাঁদের এক সভায় কনভেনশনের সম্ভাব্য দিন স্থির ক'রেছেন ২৭ সেপ্টেম্বর। তাঁরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই কনভেনশনকে সফল ক'রতে আগে থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সভা আর আলোচনাচক্র আয়োজন ক'রে সব স্তরের বিজ্ঞানকর্মীর সামনে উপরোক্ত দাবীগুলোকে ব্যাখ্যা করা হবে ও আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের মতামত চাওয়া হবে। দক্ষিণ কলিকাতার প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলোচনা করার দায়িত্ব নিয়েছেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের প্রতিনিধিরা। একইভাবে মধ্য ও উত্তর কলিকাতার ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে কলেরা রিসার্চ সেন্টার ও সাহা ইনষ্টিটুটের

প্রতিনিধিরা। প্রস্তুতি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কনভেনশনে তাঁরা আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটা যৌথ কার্যকরী কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেবেন। ঐ কমিটির নিয়মাবলী ও আশু কর্মসূচীর খসড়াও কনভেনশনে পেশ করা হবে। কনভেনশনের প্রস্তুতির ব্যাপারে বিজ্ঞানকর্মীরা প্রস্তুতি কমিটির নিম্নোক্ত সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে পারেন। শ্রীজ্ঞান শীল (কলেরা রিসার্চ সেন্টার), শ্রীবিনায়কদত্ত রায় ও শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য (সাহা ইনষ্টিটুট), শ্রীরঞ্জিত সাহা ও শ্রীসলিল চক্রবর্তী (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)

বিজ্ঞানকর্মীদের কাজের স্বাধীনতা, চাকুরীর নিরাপত্তা, আর বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় তাঁদের সরাসরি অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ইউনেস্কো থেকে র'য়েছে সুস্পষ্ট সুপারিশ। বিজ্ঞানকর্মীদের বিশ্বসংস্থা ও তাঁদের দাবীসনদে এর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ভারত সরকারের ১৯৫৮ সালের বিজ্ঞাননীতিবিষয়ক প্রস্তাবে বলা হ'য়েছিল যে বিজ্ঞানকর্মীদের সম্মানজনক চাকুরীর সর্তসহ বিজ্ঞাননীতি প্রণয়নের অংশীদার করা হবে।

> "সদস্য রাষ্ট্রদের এমন ধরণের অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করা উচিৎ যাতে বৈজ্ঞানিক গবেষকরা.....নিম্নলিখিত দায়িত্ব বহন করেন:
>
> (ক) চিন্তাগত স্বাধীনতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে বৈজ্ঞানিক সত্যকে তাঁরা যেভাবে দেখছেন তার স্বপক্ষে দাঁড়ানো.....
>
> (খ) তাঁরা যেসব প্রকল্পে র'য়েছেন সেগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রণয়নে অংশগ্রহণ করা....."
>
> 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৯৭৭ সংখ্যায় মুদ্রিত ইউনেস্কো (UNESCO)-র সুপারিশ।

> "The Government of India have decided to pursue and accomplish these aims [regarding Science Policy] by offering good conditions of service to scientists and according them an honoured position by associating scientists with the formulation of policies....."
>
> Scientific Policy Resolution of 1958 adopted by the Indian Parliament

অথচ তার কুড়ি বছর পর বিজ্ঞানকর্মীদেরকে 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক অবসানের জন্য আন্দোলনের কথা ভাবতে হ'চ্ছে। বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা সরকারের গৃহীত নীতিকে আজ নির্মমভাবে ব্যঙ্গ ক'রে চ'লেছে। সম্প্রতি দিল্লী হাইকোর্টে CSIR সংক্রান্ত এক মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারকেরা ব'লেছেন যে কর্মীদের দাবীর যৌক্তিকতা বিষয়ে তাঁদের সমর্থন থাকা সত্বেও আইনগতভাবে তাঁরা কর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তা দিতে অপারগ। একই ধরণের রায় কলিকাতা হাইকোর্টও কলেরা রিসার্চ সেন্টার সম্পর্কে প্রকাশ ক'রেছেন।

দিল্লী, ১লা আগষ্ট (পি. টি. আই): দিল্লী হাইকোর্ট CSIR এর ডাইরেক্টর জেনারেলের বিরুদ্ধে এক কর্মীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। বিচারপতি শ্রীদেশপাণ্ডে ও শ্রীজৈন মন্তব্য করেছেন যে CSIR এর ক্ষেত্রে সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে বিচার প্রযোজ্য নয়। বিচারপতিরা ব'লেছেন যে আদালত কর্মীদের আইনী নিরাপত্তার দাবীর প্রতি "সহানুভূতিশীল" কিন্তু এ ব্যাপারে "সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিরাপত্তা দিতে অপারগ।"

সূত্র: অমৃতবাজার পত্রিকা ২/৮/৭৮

সর্বস্তরের বিজ্ঞানকর্মীদের আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে উপরোক্ত দাবী তিনটি আদায়ের আন্দোলনে সামিল হতে। ইউনেস্কোর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সুপারিশের আর ভারত সরকারের গৃহীত নীতির ইতিবাচক দিকগুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার কোনই যৌক্তিকতা আজ থাকতে পারে না। আদালতের বিচারকরা যে পরিস্থিতিতে একটা দাবীকে সমর্থন করা সত্বেও আইনের বাধার দরুণ তার স্বপক্ষে রায় দিতে পারেন না, সে পরিস্থিতির আশু অবসান চাই।

আনন্দের কথা, প্রস্তুতি কমিটির প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানকর্মীরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা সাড়া দিয়েছেন। সুদূর আমেদাবাদে পি. আর. এল এর কর্মীরা এখান থেকে পাওয়া প্রচারপত্রগুলোকে গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ ক'রে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁদের কাছে থেকে এখানকার বিজ্ঞানকর্মীরা নিশ্চয়ই যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাবেন। আমরা এই আন্দোলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদকমণ্ডলী
"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর"র পক্ষে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত আলোচনাচক্র আয়োজন করার জন্য একটি 'আলোচনাচক্র উপসমিতি' গঠন করেছেন। যাঁরা এই আলোচনাচক্রগুলিতে অংশগ্রহণ ক'রতে ইচ্ছুক বা যাঁদের এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব র'য়েছে তাঁরা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

Subrata Pal
Dept. of Physics (Biophysics) University College of Science
92 Acharya Prafulla Ch. Rd. Calcutta-700009

IACS-এর গবেষককর্মীদের সগংঠন

প্রায় একশ বছর আগে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ঢেউ এদেশে গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল কুসংস্কারে ভরা অনগ্রসর এই দেশকে বিজ্ঞান-আলোকে উদ্দীপ্ত করে বিজ্ঞান-চর্চা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে গবেষণালব্ধ ফলগুলিকে সমাজের স্বার্থে প্রয়োগ করে এই দেশকে স্বয়ংনির্ভর অগ্রসর এক দেশে পরিণত করা। সেই ভাবনার অন্যতম ফলশ্রুতি "ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন্ ফর্ দি কালটিভেশন্ অফ সায়েন্স (I A C S)।" কিন্তু সমাজ-কাঠামো অবিকৃত রেখে বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণা কী চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে, কী অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, এই বোধ এই দেশের পুরোধা বিজ্ঞানীদের না থাকায় ইংরেজ চলে যাওয়ার তিরিশ বছর পরও বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলন সাধারণ মানুষের জীবনধারায় ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। I A C S এর ইতিহাসও সেই ধারাচ্যুত নয়। তাই শুরুর প্রত্যাশার দীপ্তি ক্ষীণপ্রভ হয়ে উঠল, বিদেশের প্রতি অন্ধ মোহ, অনুকরণ প্রিয়তা ও সমাজের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মমুখী কার্যকলাপের জালে জড়িয়ে পড়ল গবেষণার ধারাটি। বিভিন্ন সময়ে আদর্শবাদী বিজ্ঞানীরা এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন, কিন্তু সংঘচেতনার অভাবে তাঁদের এই প্রতিবাদ সহজেই স্বার্থান্বেষী চক্রের আঘাতে স্তব্ধ হয়েছিল। I A C S প্রতিষ্ঠার ঠিক একশ বছর পরে তরুণ গবেষকবন্ধুদের প্রয়াসে গড়ে উঠল "রিসার্চ স্কলারস্ এ্যাসোসিয়েশন" (R S A)—বিবিধ পিছুটান, হুমকি, প্রলোভনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে শতবর্ষের প্রাক্কালে জরুরী অবস্থার করাল রূপকে উপেক্ষা করে গড়ে তুলল বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবিভিত্তিক এক আন্দোলন। কিন্তু শতবর্ষ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আগমনের সুযোগে কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলনের ওপর আনল তীব্র আঘাত। সাময়িকভাবে আন্দোলন পিছু হটতে বাধ্য হল। ১লা বৈশাখ, ১৩৮৪ (১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৭) আবাসিক হোষ্টেলে ঘটল এক দুর্ঘটনা। হোষ্টেলের সমস্ত আবাসিক গবেষকরা পানীয় জলের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। এই ঘটনার প্রতিবাদে R S A ১৬ই এপ্রিল ধর্মঘটের ডাক দিল—সেই ডাকে সাড়া দিল "এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন" ও "এ্যাসোসিয়েশন্ ফর রিডারস্, রিসার্চ অফিসারস্ এ্যাণ্ড লেক্‌চারারস্"—ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হল। সবাই বুঝলেন, পানীয় জল বিষক্রিয়ার ঘটনাটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—কর্তৃপক্ষের দীর্ঘকালীন উদাসীনতা, অক্ষমতা আর দুর্নীতিরই ফলশ্রুতি। তার প্রতিক্রিয়া পড়ল পরবর্তীকালে বিভিন্ন পদে নিয়োগের সময়—যোগ্য গবেষকরা যারা বিগত দিনের আন্দোলনগুলিতে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিল সুচতুরভাবে তাদের বাদ দেওয়া হতে লাগল, নির্বাচিত হতে লাগল কর্তৃপক্ষের ধামাধরা লোকেরা। গবেষকদের এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে R S A কাউন্সিল মিটিংএ (১৬ই ও ১৭ই জুলাই ১৯৭৭) জানাল তীব্র বিক্ষোভ। কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যে নেওয়া হয়েছিল তা স্বীকার করে নিতে ও ভবিষ্যতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবেনা এই আশ্বাস দিতে বাধ্য হল। RSA পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলে। স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ এর নিয়মগুলির পুরোপুরি পরিবর্তন, Independent Senior Fellowship (Post-Doctoral), Thesis এর জন্য আর্থিক সাহায্য, হোষ্টেলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, অন্যত্র কাজ করতে যাওয়ার সময় T. A. ও D. A. প্রদান প্রভৃতি অনেকগুলি দাবী আদায় করতে R S A সক্ষম হয়। গবেষকদের দুর্ঘটনা বা অসুস্থতাজনিত কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় গবেষকরা নিজেরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করে গড়ে তুলল "Research Scholars' Medical Aid Fund"। কাউন্সিল ছাড়া Academic Board, Scholars' Welfare Committee, library Committee, Workshop Committee তে গবেষকরা তাদের প্রতিনিধিত্ব অর্জন করে।

১৯৭৮ এ R S A নির্বাচনের প্রাক্কালে কর্তৃপক্ষ ও স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি গবেষক, প্রগতিবাদী Academic Staff আর কর্মচারীদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে ভাঙ্গার চক্রান্ত করল। কিন্তু পন্থনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যার বিরুদ্ধে একসাথে জমায়েত ও বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রমাণ করল, তাদের ঐক্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধরান সম্ভব নয়। তখন গবেষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চালান হল। কিন্তু নির্বাচনে প্রগতিশীল গবেষকদের বিপুল সমর্থনে জয়লাভ সেই বিভেদ প্রয়াসকে পরাস্ত করল। এর মাঝে কতকগুলি রিসার্চ অফিসারস্ ও লেকচারার পদে মনোনয় ও নিয়োগের সময় সেই পুরোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থার খেলা দেখা গেল। এর প্রতিবাদে ৩১শে মে (১৯৭৮) কাউন্সিল সভায় গবেষকরা ও কর্মচারীরা দীর্ঘ বিতর্কের পর একটি "অনুসন্ধান কমিটি" বসাতে ও তার মতামত সাপেক্ষে নিয়োগপত্র দেওয়া বন্ধ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া "সিলেকশন কমিটি"র গঠনে ও কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

R S A গড়ে উঠেছে মাত্র চার বছর আগে। কিন্তু এই অল্প সময়ে আন্দোলন গড়ে তুলে R S A এক সংহত শক্তিতে রূপ পেয়েছে। গবেষকদের আয়ু এখানে কেবলমাত্র কয়েকটি বছরের, ভবিষ্যতও তাদের

অনিশ্চিত। তবু জীবনের এই মূল্যবান সময়কালে বিজ্ঞানচর্চা, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর প্রগতিবাদী অনুষ্ঠান আয়োজন করে চলেছে। শুধুমাত্র নিজেদের দাবী পূরণের জন্যই আন্দোলন তাদের লক্ষ্য নয়, বিজ্ঞান নীতির জনবিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলাও এই সংস্থার লক্ষ্য। দেশের বিজ্ঞানকর্মীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণে এই সংস্থা অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই বোধেই "পঃ বঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার" সাথে R S A আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্সের গবেষক সংগঠনের পক্ষে।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী :

বাৎসরিক চাঁদার হার :—তিন টাকা

" (সডাক) সাড়ে চার টাকা

নাম, ঠিকানা সহ যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

C/o. ডি, এস, এণ্টারপ্রাইজেস

৫২/৯সি বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

ডিক্লারেশন নং : ৪৯/৭৮

For all Electrical, Electronic Components and Equipments and any other odd items

Please contact :

D. S. ENTERPRISES

52/9C, B. B. Ganguly Street (1st floor),

Calcutta-700 012

(We also Supply Hydrogen, Nitrogen, Oxygen & other cyllinders of various capacities ; Silica & Quartz tubes of different sizes)

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মায়হাট্টা ডিচ্‌ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।